অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। গোপন কথাটি র'লো না গোপনে ।।

গত ডিসেম্বরে দেশে গিয়েছিলাম অনেকটা হঠাৎ করেই। মা'য়ের শরীরটা ভালো ছিলো না। নানান সব বার্ধক্যজনিত সমস্যা। বয়সও হয়ে গেছে পঁচাশি। যাহোক মা'কে দেখতে মনটা খুব উতলা হয়েছিলো। দিলাম ছুট। মা থাকেন চাঁদপুরে বড় বোনের কাছে। মা'কে দেখে ঢাকায় ফিরছি একটা ব্যাটারীতে। না মোটেই ভুল বলিনি। আজকাল দেশে ব্যাটারীচালিত রিকশা এবং প্রাক্তন বেবী (বেবীট্যাক্সি - সবাই আদর করে ডাকে 'বেবী') পাওয়া যায়। দু'টোতেই চড়েছি। যান্ত্রিক দূষণের কথা ভাবলে চড়তে মন্দ নয়। ফলে ব্যাটারীচালিত রিকশা এবং বেবীর নাম - সরি আদুরে নাম এখন 'ব্যাটারী'। ব্যাটারীতেই লঞ্চঘাটে যাচ্ছি। হঠাৎ চোখে পড়লো একটি রাজনৈতিক পোষ্টার। পোষ্টারে খুব বড় করে লেখা " মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী আলহাজ্ব ডাঃ দীপু মনির চাঁদপুরে শুভ আগমন"। নিজে নিজে একটু শব্দ করেই পোষ্টারটা পড়ছিলাম। ব্যাটারী চালক মফিজ আমার কথা শুনে বললেন - বুঝলেন না স্যার ভোটের লাগি অহনগা নামের আগে 'আলহাজ্ব' লাগায়। সরকারী পয়সায় হজ্ব কইরা নামের আগে আলহাজ্ব লাগায় অগো কী লজ্জাশরম আছেনি? আমি মফিজকে বললাম - আহা আপনাদের চাঁদপুরেরইতো মেয়ে। হোক না চাঁদপুরের মাইয়্যা চাঁদপুরের জন্য কোরছেডা কী? যেহেতু আমি চাঁদপুরে থাকি না তাই বিশেষ বলতে পারবো না চাঁদপুরের জন্য মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী আলহাজ্ব ডাঃ দীপু মনি কী করেছেন না করেছেন, তবে মনে হলো লোকজন খুব একটা খুশী না তাঁর উপর।

আমার একটা স্বভাব আমি সবসময়ই রিকশা বেবীতে চড়লে চালকের সাথে কথা বলি। ওদের সাথে কথা বললেই একটা ধারণা করতে পারি দেশ কেমন চলছে বা ক্ষমতাসীনরা দেশ কেমন চালাচ্ছেন। তেমনি জানা যায় দেয়ালের লিখনগুলো পড়লে। পড়তে বেশ মজাও লাগে। যাহোক আমি মফিজের কথায় কান রাখি। যত কিছুই করুক এইবার আর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাইতে পারবো না। আমি সুধাই কেন? উত্তরে মফিজ বললেন - ক্ষমতায় যাওয়ার আগে আওয়ামী লীগ কইছিলো দশ টাকা কেজি চাইল খাওয়াইবো আর অহন তার তিন চার গুন দামে চাইল খাইতাছি। অহন দ্যাশের মানুষ সজাগ হইছে অহন আর ভুট (ভোট) কিনন যাইতো না। মফিজ আরো অনেক কথাই সরকারের বিরুদ্ধে বললেন। তাঁর কথায় বুঝলাম তিনি আর যাই হোন আওয়ামী পক্ষের লোক নন। যাহোক তাঁর কথার মাঝে ঢুকে গিয়ে বললাম - হ্যাঁ, মানুষের সাথে কথা বলে বুঝছি মানুষ এখন অনেক সচেতন। দেশের এবং নিজের ভালো মন্দ বোঝে। আর বোঝে বলেই আগের মত ভোট কেনা যাবে না। কিন্তু আপনি বললেন আওয়ামী লীগ বলেছে দশ টাকা কেজি চাল খাওয়াবে আপনি কী নিজ কানে তা শুনেছেন? মফিজের উত্তর - না মানি হ্যাঁ ওই হগ্‌গলেই তো তাই কইতাছে। আমি তর্কে না গিয়ে বললাম - মফিজ, ১৯৭২ সাল থেকে আমি নিয়মিত চাঁদপুরে যাতায়াত করি। আমি যেখানে থাকি সেখান থেকে লঞ্চঘাটে আগে রিকশায় দিতাম তিন টাকা আর বেবীতে দিতাম

দশ টাকা। বছর কয়েক আগেও বেবীতে গেছি ত্রিশ টাকা দিয়ে। আজ আপনাকে দিতে হবে একশো দশ টাকা। আপনাদের সবার ভাড়া বাড়তে পারবে, সবার বেতন বাড়াতে হবে শুধু চালের দাম কমাতে হবে - কৃষকের দাম কমাতে হবে কৃষি পণ্যের দাম কমাতে হবে। এটা কোন দেশী স্বাধীনতা - কোন দেশী আবদার - কোন দেশী গনতন্ত্র বলতে পারেন? কৃষক যা কিছু কিনবে, বা বাঁচার জন্য ঔষধ পথ্য খাদ্য বাসস্থান শিক্ষা যা কিছু নিত্য প্রয়োজন সব কিছুই তাকে দ্বিগুন তিনগুন দিয়ে কিনতে হবে শুধু তার উৎপাদনটা আপনাদের ইচ্ছামত দামে নামমাত্র মূল্যে দিতে হবে। কেন? একবার কী ভেবে দেখেছেন দেশের ষাট ভাগ মানুষই কিন্তু কৃষিজীবি বা কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট অথচ রাজনীতি সব সময়ই ওদেরকে নিয়ে। সবাই কথায় লেখায় বক্তৃতায় বলবেন - কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে - অথচ পারলে কৃষকের কাছ থেকে 'মাগনা' ফসল নেবার জন্য সবাই উদগ্রীব। আপনাদের লজ্জা হয় না দশ টাকা কেজি চাল খাবার স্বপ্ন দেখতে? লজ্জা হয় না কৃষকের রুটিরুজি নিয়ে রাজনীতি-রাজনীতি খেলতে? আমার ইচ্ছে হয় যারা বলে দশ টাকা কেজি চাল খাওয়াবো এবং দশ টাকা কেজি চাল খাবার আশায় বসে থেকে রাজনীতি করে তাদের সবাইকে ------(যে কথাটি বলতে চাইছিলাম তা আর বলা হয়নি) । আপনাদের সবার দাম বাড়তে পারবে কেবল কৃষকের দাম বাড়তে পারবে না। তাই না? ছিঃ।

বুঝতে পারছিলাম খুব উত্তেজিত হয়ে গেছি। মফিজও বুঝতে পেরেছিলো তাই কিছু সময় চুপ থেকে তারপর বললো - আসলে স্যার আপনি যেমুন কইরা কইলেন তেমুন কইরা ভাবি নাই। তেমুন কইরা কেউ কয়ও না। আপনের কথাই ঠিক। তয় আমরা গরীব মানুষরা চাইলের দামটা কম পাইলে মনে করি সুখে আছি। দুইডা খাইতে পারুম। হ, আপনের কথাডাই সঠিক কৃষকরে বাঁচাইতে হইবো বাঁচতে দিতে হইবো।

কৃষক আছে বলেই দেশটা বেঁচে আছে। যতবারই দেশে যাই প্রতিবারই দেখি এবং বুঝতে পারি দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। নানা রাজনৈতিক প্রতিকূলতা এবং শত নৈরাজ্য দূর্নীতির মাঝেও দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। শত রাজনীতি দিয়েও দেশের এই এগিয়ে যাওয়া ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। দেশ এগুচ্ছে বলেই এখন সবাই কাজ করছে, হাতে পয়সা হচ্ছে তাতে করে মানুষের রুচি জীবনযাত্রা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তিত হচ্ছে। পেশার কারণ ছাড়া আজকাল আর কেউ ভিক্ষে করে না নিতান্ত শারীরিকভাবে অক্ষম না হলে। গ্রামে গঞ্জে গরীব মানুষ বলে যাদের দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে সবাই দেখাতো তাদেরকে সচরাচর আর চোখে পড়ে না। সেই গ্রামে গঞ্জে এখন ডিশ, মোবাইল, গাড়ী, যান্ত্রিক কৃষি সরঞ্জামের ছড়াছড়ি। গ্রাম আর আগের গ্রাম নেই। গ্রাম এখন শহুরে গ্রাম। আধুনিক গ্রাম। ধান ক্ষেতে এবার জিন্‌স-এর প্যান্ট আর টি-সার্ট পরে জোয়ান কৃষককে কাজ করতে দেখেছি। সেই নেংটী পরা হাল কাঁধে কৃষক এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কৃষকও রাজনীতি আর রাজনীতিবিদদের আশায় বসে নেই। কৃষক এখন নিজেরাই এন্টারপ্রেনুয়ার। নিজেদের এন্টারপ্রাইজ, টেকনোলোজী নিজেরাই উদ্ভাভাবন করে। ১৯৭১-এ যখন দেশ স্বাধীন হলো তখন দেশের লোক সংখ্যা ছিলো সাড়ে সাত কোটি আর আজ চার দশকে সে লোক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পনেরো কোটির উর্ধে। আবাদী জমি এককোণাও বাড়েনি কোথাও বরং এক দশমাংশ কমেছে নগরায়ণ আবাসন আর শিল্প-কারখানা স্থাপনের কারণে। তা'হলে এই পনেরো কোটি মানুষের অন্ন আসে কোত্থেকে? কে জোগায় সে চাল? যৌথভাবে এ কৃতিত্ব দেশের কৃষি বিজ্ঞানী এবং কৃষকের। উচ্চ ফলনশীল ধানের ক্রমাগত

উদ্ভাবনের কল্যাণে এবং তিন মৌসুম সে ধান আবাদের কারণে (আগে মাত্র এক মৌসুম ধানের আবাদ করা যেতো) এখন চালের তেমন ঘাটতি নেই। যতটুকু ঘাটতি আমি বলবো সেটা রাজনৈতিক ঘাটতি। অর্থাৎ এ ঘাটতিটা তৈরী করা হয় রাজনীতির স্বার্থে।

আমাদের অতীত ধারণা মাচা ছাড়া লাউ সীম হয় না। কৃষক নিজেরাই টেকনোলোজী পরিবর্তন করে ফেলেছে। আজকাল জমির আইলের উপর গাছের ডাল পুঁতে দিয়ে গোড়ায় সীম লাগিয়ে দেয়। ওই ডাল বেয়ে সীম গাছ বেড়ে উঠে এবং ওটাই পরবর্তীতে সীমের গাছ হয়ে যায়। ওর আর মাচা লাগে না। প্রচুর ফলন। লাউ এখন মাটিতেই হয়। তারও মাচা লাগে না।

তাই কৃষককে নিয়ে রাজনীতি না করে সকল কৃষি উপকরণ কৃষকের দোর গোড়ায় নেয়ার রাজনীতি করতে হবে। কৃষক যেন তার উৎপাদনের ন্যায্যমূল্য পায় সে বাজার নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয়পক্ষ বা মধ্যসত্বভোগকারী যেন কৃষকের উৎপাদনে হাত না বসাতে পারে এখন সেই রাজনীতির প্রয়োজন। চালের দাম কমানোর রাজনীতি করে কোন দলই আর নির্বাচন বৈতরনী পার হতে পারবে না। কথাটা বোধ হয় একমাত্র রাজনীতিবিদ মতিয়া চৌধুরীই বোঝেন। তিনিই অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সাহসিকতার সাথে কৃষির সার্বিক উপকরণ কৃষকের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছেন। কৃষককে আর সার বীজ ডিজেল কীটনাশক কিনতে মহাজনের কাছে বা শহরে ছুটতে হয় না। কৃষকের পণ্যের বাজারও তার হাতের কাছে, যদিও ফড়িয়া দালালের দৌরাত্ম কমেনি। যেমন কমেনি কৃষকের পন্যে বিষ ফরমালিন প্রাণনাশক কেমিক্যাল মিশিয়ে যারা দূর্বৃত্ত করছে তাদের। এ'দুটো জায়গায় আর একজন মতিয়া চৌধুরীর প্রয়োজন।

আমার হাজার দোষের একটি দোষ আমি লেখা শুরু করি একভাবে আর তা শেষ হয় আর একভাবে। শুরু করেছিলাম "মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী আলহাজ্ব ডাঃ দীপু মনির চাঁদপুরে শুভ আগমন" পোষ্টার দিয়ে আর এসে ঠেকলাম কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরীতে। তা এক রকম মন্দ নয়। কৃষি মন্ত্রী যদি কৃষক বাঁচাতে পারেন তবে না দেশ বাঁচবে। আর দেশ বাঁচলেই না দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দরকার হবে। তারপরেই না দেখা যাবে তিনি আলহাজ্ব কিনা। সামনের দিন গুলোতে মফিজরা এগুলোরই হিসেব নিকেশ করবে। আগামী নির্বাচন কিন্তু এই মফিজদের হাতে।

যাক্‌গে আমি রাজনীতিবিদ নই। এসব আমলে নেয়া না নেয়া তাঁদের ব্যপার। তবে মুক্তিযুদ্ধের বেঈমান এবং তাদের বন্ধু-সহযোগীদের কোনভাবে ক্ষমতায় আর দেখতে চাই না। তাতে আমার পতাকা কাঁদে। স্বাধীনতার বীর যোদ্ধারা কাঁদে। শহীদের আত্মারা কাঁদে।

দেশে যাবার গল্প দিয়ে শুরু করেছিলাম। ফিরে আসার দিনের গল্পটা দিয়ে তবে শেষ করি। দেশ থেকে যেদিন ফিরে আসি সেদিন প্লেনে আমার পাশে যে ভদ্রলোক বসেছিলেন তিনি একজন জ্ঞানী-গুনী মানুষ। দেশে বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকতা করেছেন। এখন দেশের নামকরা একজন শিল্পপতি। নানান কথা বার্তা হলো তাঁর সাথে। কথায় কথায় বললেন চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর যাচ্ছেন। একটা সঙ্গত ব্যাখ্যাও দিলেন এতো বড় শিল্পপতি হয়েও কেন বিজনেস ক্লাসে না বসে আমার সাথে সস্তা আসনে বসেছেন। নানান বিষয়ে আমাদের গল্প হলো। প্লেন তখন সিঙ্গাপুরে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমি বললাম এতোক্ষণ

আলাপ হলো অথচ আপনার নামটাই জিজ্ঞেস করা হয়নি। নাম বললেন। তারপর রসিকতা করে বললেন - আপনি 'ঠ্যাটা মালিক্কার' নাম শুনেছেন? বললাম স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা যার মনে থাকবে তার পক্ষে ঠ্যাটা মালিক্কার নাম কোনভাবেই ভুলে যাবার কথা নয়। তিনি বললেন আমি সেই ঠ্যাটা মালিক্কার নাতি। বলে হো হো করে অট্টহাসি দিয়ে বললেন আমি সবাইকেই এভাবে আমার পরিচয়টা দেই তাতে করে আমাকে মনে রাখতে সুবিধা।

আমি অনেকটা হতভম্ব হয়ে গেছি। এরপর কী বলবো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। মনের মধ্যে তখন বলার জন্য যে কথাটা আকুপাকু করছিলো তা বলতে গিয়েও বলতে পারছিলাম না। এর মধ্যেই ল্যানিডং-এর প্রস্তুতি নিচ্ছে সবাই। ভাবলাম প্লেন থেকে বেরিয়ে তাঁকে বলবো। তাও হলো না। তাঁকে আর দেখতে পেলাম না। বলাই হলো না আপনার দাদুকে (মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অবরুদ্ধ পূর্ব পাকিস্তানের কুখ্যাত গভর্ণর আবদুল মালেক) চরমপত্রের মাধ্যমে যিনি "ঠ্যাটা মালিক্কা" নামটি দিয়েছিলেন আমি তাঁর পরিবারের একজন।

গোপন কথাটি র'লো না গোপনে .....